OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 17 - 26
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 17 - 26
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

মুণ্ডকোপনিষদের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব : ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মস্বরূপের অনুসন্ধান

ড. সুনীতা খাঁ
সহকারী অধ্যাপক, সি ডি ও ই,
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, সল্টলেক, কলকাতা
Email ID: sunitakhan768@gmail.com

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Mundaka Upanishad, Brahman, Atman, Para Vidya, Avidya, Self-Knowledge, Liberation.

Abstract
The Mundaka Upanishad presents a profound spiritual quest for the realization of the ultimate reality, Brahman, and the true nature of the Self (Atman). It distinguishes between Apara Vidya, comprising worldly and scriptural knowledge, and Para Vidya, through which the imperishable Brahman is realized. The Upanishad emphasizes that ignorance (Avidya) is the fundamental cause of human bondage, while self-knowledge (Atma-Jnana) removes ignorance and leads to liberation. Brahman is described as the unchanging, self-luminous and ultimate cause and substratum of the universe. Through meditation on Om, purification of the mind, detachment, self-discipline, and guidance from a qualified teacher, the seeker progresses towards spiritual realization. The metaphor of the two birds illustrates the relationship between the individual self and the witnessing Supreme Self. Ultimately, realization of the identity between Atman and Brahman liberates the individual from sorrow, attachment, karma and bondage, leading to spiritual freedom and immortality.

Discussion

সভ্যতার আদিলগ্ন থেকে শুরু করে মানুষ যে ক্রমবিকাশের দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছে, সেই অভিযাত্রায় সে ক্রমশ নিজেকে সৌন্দর্যশালী, শক্তিশালী, তেজস্বী ও মহান সত্তারূপে প্রকাশ করেছে। মানবসভ্যতার এই অবিরাম অগ্রযাত্রার অন্তরালে রয়েছে মানুষের নিজস্ব সত্তাকে জানার এবং তার চরম সত্যকে উপলব্ধি করার এক অনন্ত আকাঙ্ক্ষা। মানুষ প্রতি মুহূর্তে তার শাশ্বত সত্তার অনুসন্ধান করে চলেছে। মানবের সেই শাশ্বত গৌরব নিহিত রয়েছে তার সহজাত, নিত্য, অপরিবর্তনীয়, শুদ্ধ ও পবিত্র ভাগবত সত্তার মধ্যে। মানুষ কেবল একটি ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ ও শরীরনির্ভর সত্তা নয়; তার অন্তরে বিরাজমান এক অসীম চৈতন্যসত্তা। সেই অসীম সত্তাই ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ শরীরের মাধ্যমে নিজেকে ব্যক্ত করেছে। এই অসীমের সঙ্গে মানুষের অন্তর্নিহিত যোগই মানুষের প্রকৃত পরিচয় এবং এটাই তার প্রকৃত গৌরব। উপনিষদ মানুষকে তার সেই প্রকৃত ও শাশ্বত সত্তার সন্ধান পেতে সাহায্য করে। 'উপনিষদ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ— আচার্যের নিকটে উপবেশন করে যে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 17 - 26
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গুপ্ত ও গভীর জ্ঞান শিষ্য লাভ করে। এই জ্ঞান মানুষকে বাহ্যিক জগতের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে নিজের অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তি বা স্বাধীনতাই উপনিষদের অন্যতম মূল মন্ত্র। উপনিষদ মানুষের সামনে মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে এবং তাকে সকল প্রকার দুর্বলতা, ভয়, অজ্ঞানতা ও বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আহ্বান জানায়। তাই উপনিষদের বাণী মানুষের অন্তরে শক্তি, সাহস ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। মানুষ আজও আলোর সন্ধান করছে— যে আলো তাকে অন্ধকার থেকে মুক্ত করবে। সে এমন এক পরম সত্যের অন্বেষণ করছে, যা তাকে অসত্যের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবে। সে এমন অমৃতের সন্ধান করছে, যা তাকে মৃত্যুর সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে অমৃতত্বের উপলব্ধিতে পৌঁছে দেবে। উপনিষদের বাণীর মধ্যেই নিহিত রয়েছে এই সত্য, আলো ও অমৃতের সন্ধান।[১] স্বামী বিবেকানন্দ উপনিষদসমূহকে শক্তির ভাণ্ডাররূপে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, উপনিষদের শিক্ষা মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, আত্মশক্তি ও বিশ্বাসাত্মক ভাব জাগিয়ে তোলে। মানুষ যেন নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারে এবং নিজেকে নিজের মধ্যে তথা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নিবিড়ভাবে অনুভব করতে পারে— উপনিষদের শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য এটাই। অতএব, উপনিষদ কেবল প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ নয়; এটি মানবের আত্মঅন্বেষণ, আত্মজাগরণ ও আত্মমুক্তির এক চিরন্তন পথনির্দেশ। মানুষের অন্তর্নিহিত অসীম শক্তি ও শাশ্বত সত্তার উপলব্ধির মধ্যেই তার প্রকৃত গৌরব নিহিত— উপনিষদের চিরন্তন বাণী আমাদের সেই সত্যেরই সন্ধান দেয়।

অথর্ববেদের শৌনক-শাখার অন্তর্গত মুণ্ডক উপনিষদ। 'মুণ্ডক' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'মুণ্ডিত'— অর্থাৎ যার মস্তক মুণ্ডিত হয়েছে। 'মুণ্ড' শব্দের দ্বারা মূলত মাথার চুল অপসারণকে বোঝানো হয়। তবে 'মুণ্ডক' শব্দটির আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ রয়েছে। মুণ্ডক উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা মানুষের অন্তর থেকে অজ্ঞান, ভ্রান্তি ও অবিদ্যার আবরণ দূর করে তাকে পরম সত্যের উপলব্ধির পথে পরিচালিত করে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের মাধ্যমে মানুষের সমস্ত অবিদ্যা বিনষ্ট হয়। উপনিষদের মূল শিক্ষা অনুসারে, আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ব্রহ্মস্বরূপ। মানুষের অন্তরে দেবত্ব বা ব্রহ্মসত্তা নিহিত রয়েছে। কিন্তু অবিদ্যার প্রভাবে মানুষ তার সেই মূল ও শাশ্বত স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারে না। নিজের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে এই অজ্ঞতাই মানুষের বন্ধনের মূল কারণ। মুণ্ডক উপনিষদের জ্ঞান সেই অজ্ঞানতার আবরণ দূর করে মানুষকে আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। মুণ্ডক উপনিষদের সূচনা হয়েছে ঋষি শৌনক ও মহর্ষি অঙ্গিরার মধ্যকার প্রশ্নোত্তর সংলাপের মাধ্যমে। শ্রেষ্ঠ গৃহী শৌনক মহর্ষি অঙ্গিরার নিকট উপস্থিত হয়ে একটি অত্যন্ত গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেন— 'কোন্ বস্তুকে জানলে এই জগতের সমস্ত কিছু জানা যায়?' তিনি জানতে চেয়েছিলেন, এমন কোনো এক পরম তত্ত্ব আছে কি না, যাকে জানলে জগতের অন্য সমস্ত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। শৌনকের এই প্রশ্নের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল— জগতের বহুবিধ প্রকাশের পশ্চাতে যে এক ও অদ্বিতীয় পরম কারণ বিরাজমান, সেই মূল তত্ত্বকে কীভাবে জানা যায়?[২] তিনি সেই পরম সত্য বা জগতের প্রধান কারণ সম্পর্কে গুরুর নিকট জ্ঞান লাভ করতে আগ্রহী ছিলেন। এই প্রশ্নের মধ্য দিয়েই মুণ্ডক উপনিষদ বাহ্যজগতের বহুত্ব অতিক্রম করে এক পরম ও অদ্বিতীয় সত্যের অনুসন্ধানের পথ উন্মুক্ত করেছে। অতএব, মুণ্ডক উপনিষদের মূল লক্ষ্য কেবল জাগতিক জ্ঞান প্রদান নয়; বরং অবিদ্যা ও অজ্ঞতার আবরণ দূর করে মানুষের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি ঘটানো। আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্য দিয়েই মানুষ তার প্রকৃত স্বরূপকে জানতে পারে এবং পরম সত্যের সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি লাভ করতে পারে। মহর্ষি অঙ্গিরা শৌনককে বলেছেন যে বিদ্যা প্রধানত দুই প্রকার— পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হল ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ— এই চার বেদ ও ছয় বেদাঙ্গ। এগুলি জাগতিক ও শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পক্ষান্তরে, যে বিদ্যার দ্বারা সেই নিত্য, শাশ্বত, অবিনাশী অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায়, তাকেই পরা বিদ্যা বলা হয়। অর্থাৎ যে বিদ্যার মাধ্যমে পরম ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় এবং মানুষের অজ্ঞানতার অবসান ঘটে, সেটিই পরা বিদ্যা। মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে অপরা বিদ্যার চর্চারও বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।[৩] শাস্ত্র ও বেদাঙ্গের অধ্যয়ন মানুষের জ্ঞানকে পরিশুদ্ধ ও সুসংহত করে এবং তাকে পরমতত্ত্বের অনুসন্ধানের উপযুক্ত করে তোলে। আচার্য শঙ্করের ব্যাখ্যায়, বেদান্তের মূল লক্ষ্য হল 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'— অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্পর্কে জানার গভীর আকাঙ্ক্ষা। বেদাধ্যয়ন ও শাস্ত্রচর্চার পর মানুষের অন্তরে যখন পরম সত্যকে জানার আকাঙ্ক্ষা জাগে, তখনই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 17 - 26
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সূচনা হয়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্বে চিত্তশুদ্ধি অপরিহার্য। যজ্ঞ, যোগ, উপাসনা প্রভৃতি সাধন ও নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের মাধ্যমে মানুষের চিত্ত ধীরে ধীরে পবিত্র ও নির্মল হয়। চিত্তশুদ্ধির পরেই ব্রহ্মতত্ত্বের অনুসন্ধান যথার্থভাবে শুরু করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে ঈশোপনিষদে বিদ্যা ও অবিদ্যা— অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কেই যথাযথভাবে উপলব্ধি করেন, তিনি অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করেন এবং বিদ্যার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন।[৪] এই দৃষ্টিতে বলা যায়— কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি এবং জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভব। কর্ম ও জ্ঞানের যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে সাধক ক্রমশ মুক্তির পথে অগ্রসর হন। তবে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী হওয়ার জন্য বিশেষ কিছু যোগ্যতার প্রয়োজন। যিনি এই জন্মে অথবা পূর্বজন্মে বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করে বেদের অর্থ উপলব্ধি করেছেন, বিধিসম্মত কর্ম সম্পাদন করেছেন, নিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগ করেছেন এবং নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনার মাধ্যমে চিত্তকে পাপমুক্ত ও নির্মল করেছেন, তিনিই বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারী হওয়ার উপযুক্ত।[৫] এর সঙ্গে তাঁর মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভের গভীর আকাঙ্ক্ষাও থাকা আবশ্যক। বেদান্তে সাধনচতুষ্টয়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই চারটি সাধন হল— নিত্যানিত্যবস্তু বিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শম-দমাদি ষট্‌সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্ব।[৬] নিত্য ও অনিত্য বস্তুর মধ্যে বিচারবুদ্ধি, ইহলোক ও পরলোকের ভোগ্যবস্তুর প্রতি বৈরাগ্য, মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযমসহ বিভিন্ন মানসিক গুণ এবং মুক্তিলাভের তীব্রআকাঙ্ক্ষা—এই চারটি সাধনের দ্বারা সাধক আত্মবিদ্যা লাভের উপযুক্ত হয়ে ওঠেন। এইরূপ যোগ্যতা অর্জনের পর সাধককে এমন একজন আচার্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, যিনি আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন এবং ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদীয় শিক্ষায় গুরুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে— ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য এমন গুরুর নিকট যেতে হবে যিনি শাস্ত্রজ্ঞ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ। অর্থাৎ যিনি কেবল শাস্ত্রের মন্ত্র জানেন তা নয়, যিনি সেই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্বকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছেন। এই প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য উপনিষদের নারদ ও সনৎকুমারের উপাখ্যান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নারদ বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করার পরও নিজের অন্তরের শোক থেকে মুক্ত হতে পারেননি। তাই তিনি সনৎ কুমারের নিকট উপস্থিত হন। নারদ জানতেন যে কেবল শাস্ত্র ও মন্ত্রের জ্ঞানই পরম জ্ঞান নয়; আত্মজ্ঞানই মানুষের শোক ও অজ্ঞানতার অবসান ঘটাতে পারে। সনৎকুমার আত্মতত্ত্বজ্ঞ হওয়ায় নারদ তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। প্রকৃত গুরু হবেন তিনি, যিনি বেদ ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং নিষ্কামভাবে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর অন্তরে যে জ্ঞানের দীপ প্রজ্বলিত, তিনি সেই জ্ঞানের আলো উপযুক্ত শিষ্যের অন্তরে প্রজ্বলিত করতে সক্ষম হন। তবে শুধু গুরুর যোগ্যতাই যথেষ্ট নয়; শিষ্যেরও যথাযথ যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। শ্রদ্ধা, বিনয়, সংযম, জিজ্ঞাসা, বৈরাগ্য এবং মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা— এই গুণগুলি একজন উপযুক্ত শিষ্যের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। অতএব, ব্রহ্মবিদ্যার ক্ষেত্রে উপযুক্ত গুরু ও উপযুক্ত শিষ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যোগ্য আচার্যের কাছ থেকে যোগ্য শিষ্যই যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে। ব্রহ্মতত্ত্বের শিক্ষা কেবল পুঁথিগত জ্ঞান নয়; এটি আত্মঅনুসন্ধান, উপলব্ধি ও অন্তরশুদ্ধির বিষয়। তাই ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষাদানের যোগ্যতা যেমন বিরল, তেমনি সেই জ্ঞান গ্রহণের উপযুক্ত শিষ্যও সংখ্যায় অল্প। উপযুক্ত গুরু ও উপযুক্ত শিষ্যের এই পবিত্র মেলবন্ধনের মধ্য দিয়েই ব্রহ্মবিদ্যার প্রকৃত উপলব্ধি সম্ভব হয়। কঠোপনিষদে যম ও নচিকেতা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন এবং অধ্যাত্ম রামায়ণে রাম ও হনুমানের গুরু-শিষ্যরূপ আশ্চর্য যুগলবন্ধনের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মবিদ্যা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিকশিত হয়েছে। গুরু ও শিষ্যের এই প্রশ্নোত্তরমূলক সংলাপের মধ্য দিয়ে পরমতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব এবং জগৎসৃষ্টির রহস্য ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়েছে।

ব্রহ্ম অবিকারী, অক্ষয় ও নিত্যসত্তা। তিনিই আবার জগতের উৎপত্তির মূল কারণ। আচার্য শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্তের বিখ্যাত সিদ্ধান্ত— "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে— এই বহুবৈচিত্র্যময় জগতকে কীভাবে 'মিথ্যা' বলা যায়? অদ্বৈত বেদান্তে 'মিথ্যা' বলতে একেবারে অস্তিত্বহীনতাকে বোঝানো হয় না; বরং যে জগতের পারমার্থিক স্বাধীন অস্তিত্ব নেই এবং যা ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীলভাবে প্রকাশিত, তাকে মিথ্যা বলা হয়। এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম থেকেই কীভাবে এই বহুবৈচিত্র্যময় জগতের প্রকাশ ঘটল— এই প্রশ্নের উত্তর দিতে মুণ্ডক উপনিষদে অত্যন্ত সুন্দর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যেমন মাকড়সা নিজের শরীর থেকে জাল সৃষ্টি করে এবং প্রয়োজন হলে সেই জালকে নিজের মধ্যেই প্রত্যাহার করে নেয়, তেমনই অক্ষর ব্রহ্ম থেকে এই জগতের প্রকাশ এবং পরবর্তীকালে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 17 - 26
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ব্রহ্মেই তার লয় ঘটে। আবার পৃথিবী থেকে যেমন বিভিন্ন প্রকার ওষধি ও উদ্ভিদের উৎপত্তি হয় এবং পরিণামে সেগুলি পৃথিবীতেই বিলীন হয়ে যায়, তেমনই এই জগতের উৎপত্তিও ব্রহ্ম থেকে এবং তার লয়ও ব্রহ্মেই। জীবন্ত মানুষের শরীর থেকে যেমন স্বাভাবিকভাবে কেশ ও লোম উৎপন্ন হয়, তেমনই অক্ষর ব্রহ্ম থেকে কোনো বাহ্যিক উপাদানের সাহায্য ছাড়াই জগতের প্রকাশ ঘটে। এই সমস্ত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ। জগৎ ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত হয়, ব্রহ্মের উপর নির্ভর করে অবস্থান করে এবং পরিণামে ব্রহ্মেই লয়প্রাপ্ত হয়। মাকড়সা যেমন জাল সৃষ্টি করার সময় নিজের স্বরূপে কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটায় না, তেমনই জগতের প্রকাশের জন্য ব্রহ্মের স্বরূপেও কোনো বিকার ঘটে না।[৭] এই কারণেই ব্রহ্মকে অবিকারী ও অক্ষয় বলা হয়। অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ—উভয়ই। 'উপাদান কারণ' বলতে যে উপাদান থেকে কোনো কার্য উৎপন্ন হয় তাকে বোঝায় এবং 'নিমিত্ত কারণ' বলতে যে কর্তার দ্বারা সেই কার্য সম্পন্ন হয় তাকে বোঝায়। সাধারণ জগতে উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ পৃথক হতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মের ক্ষেত্রে এই দুই কারণের ঐক্য স্বীকার করা হয়েছে। মাকড়সার দৃষ্টান্তটি এখানে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মাকড়সা নিজেই জাল প্রস্তুত করে এবং জালের উপাদানও তার নিজের দেহ থেকে আসে। ফলে জাল সৃষ্টির ক্ষেত্রে মাকড়সাই একদিকে নিমিত্ত কারণ এবং অন্যদিকে উপাদান কারণ। অনুরূপভাবে, জগতের সৃষ্টিতেও অদ্বৈত বেদান্তের ব্যাখ্যায় ব্রহ্মই নিমিত্ত ও উপাদান— উভয় কারণ। তবে নির্গুণ, নিরাকার, নিষ্ক্রিয় ও শুদ্ধ ব্রহ্মের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে কর্তা বা সৃষ্টিকর্তার ধারণা প্রয়োগ করা যায় না। অদ্বৈত বেদান্তের মতে, যখন ব্রহ্ম অবিদ্যা বা মায়ার উপাধির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে প্রকাশিত হন, তখন তাঁকে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলা হয়। এই উপাধিযুক্ত চৈতন্যের মধ্যেই কর্তৃত্বের ধারণা আরোপিত হয় এবং তিনিই জগতের সৃষ্টিকর্তা বা নিমিত্ত কারণরূপে প্রতীয়মান হন। অবিদ্যার দুই শক্তি— আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তির মাধ্যমে জীবের প্রকৃত স্বরূপ আচ্ছন্ন হয় এবং বহুত্বের প্রকাশ ঘটে। যেমন অজ্ঞানের ফলে অকর্তা ও অভোক্তা আত্মা নিজেকে কর্তা ও ভোক্তা বলে মনে করে, তেমনই মায়ার প্রভাবে এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বহুবিচিত্র জগতেরূপে প্রতিভাত হন। ফলে একের মধ্যেই বহুর প্রকাশ ঘটে। সগুণ ব্রহ্মের ধারণায় চৈতন্য প্রধানভাবে বিদ্যমান থেকে জগতের নিমিত্ত কারণরূপে এবং মায়া বা অবিদ্যা উপাদানরূপে কার্যকর বলে ব্যাখ্যা করা হয়। তবে অদ্বৈত দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ও মায়ার সম্পর্ক এবং জগতের কারণত্ব অত্যন্ত সূক্ষ্ম দার্শনিক বিষয়। পারমার্থিক স্তরে ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়; জগতের বহুত্ব মায়ার মাধ্যমে প্রকাশিত। অতএব, উপনিষদীয় দর্শনের মূল বক্তব্য হল— এই জগত ব্রহ্ম থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নয়। ব্রহ্মই জগতের অন্তর্নিহিত পরম সত্য। জগতের প্রকাশ ব্রহ্মের কোনো বিকার ঘটায় না; যেমন মাকড়সা জাল সৃষ্টি করেও নিজের স্বরূপে অপরিবর্তিত থাকে। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অন্তরালে সেই এক অক্ষয়, অবিকারী ও পরম ব্রহ্মই বিরাজমান।এইভাবে উপনিষদীয় ব্রহ্মতত্ত্ব আমাদের শেখায় যে বহুর অন্তরালে একের অস্তিত্ব উপলব্ধি করাই প্রকৃত জ্ঞান। বাহ্যিক বৈচিত্র্যের অন্তরালে যে অদ্বিতীয় চৈতন্যসত্তা বিরাজমান, আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানের মাধ্যমে সেই পরম সত্যের উপলব্ধিই মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য। ব্রহ্মই একমাত্র পরম সত্য। সুদীপ্ত অগ্নি থেকে যেমন অসংখ্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনই এক পরম ব্রহ্ম থেকে বহুবিধ জীব ও জগতের প্রকাশ ঘটে এবং পরিণামে সেই সমস্ত কিছু ব্রহ্মেই লয়প্রাপ্ত হয়। মুণ্ডক উপনিষদের সূচনাতেই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে— কোন্ তত্ত্বকে জানলে সমগ্র বিশ্বকে জানা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে উপনিষদ পরম ব্রহ্মের জ্ঞানকেই সর্বোচ্চ জ্ঞানরূপে নির্দেশ করেছে। একমাত্র পরম ব্রহ্মকে জানলেই জগতের প্রকৃত স্বরূপ জানা সম্ভব। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরমাত্মারই প্রকাশ। পরমাত্মা থেকে জগতের প্রকাশ ঘটেছে এবং পরিণামে জগত পরমাত্মাতেই বিলীন হয়। কার্যকে তার কারণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। কারণের জ্ঞান লাভ করলে তার কার্য সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। সেই অর্থে জগতের মূল কারণ ব্রহ্মকে জানলে জগতের প্রকৃত স্বরূপও জানা যায়। উপনিষদীয় দর্শনে জগতের লয় একটি নির্দিষ্ট ক্রমে সংঘটিত হয়। স্থূল জগতের বিভিন্ন ভোগের আধার— স্থূল শরীর, জড়ায়ুজ প্রভৃতি শরীর এবং অন্যান্য স্থূল কার্যসমূহ— শেষপর্যন্ত পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতে লীন হয়। পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিষয় এবং ইন্দ্রিয়সমূহের সমন্বয়ে গঠিত সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীরও তার কারণের মধ্যে লীন হয়। পরবর্তী পর্যায়ে পঞ্চীকৃত মহাভূতগুলি অপঞ্চীকৃত মহাভূতে লয়প্রাপ্ত হয়। অপঞ্চীকৃত মহাভূত অবশেষে অবিদ্যা বা অজ্ঞানে লীন হয়। এই অবিদ্যাও অবিদ্যোপহিত ঈশ্বর চৈতন্যের মধ্যে এবং শেষ পর্যন্ত উপাধিশূন্য, অনুপহিত চৈতন্যে লীন হয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 17 - 26
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই অনুপহিত চৈতন্যই তুরীয় চৈতন্য, পরম ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। সুতরাং বহুর অন্তরালে শেষ পর্যন্ত এক অদ্বিতীয় পরম সত্যই অবশিষ্ট থাকে। নাম ও রূপের আরোপের ফলেই এক পরমাত্মা বহুবিধ জীব ও জগতের রূপে প্রকাশিত বলে প্রতীয়মান হন। নাম ও রূপের কারণেই আমরা নিজেদের একে অপরের থেকে পৃথক বলে মনে করি। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই ভেদ প্রকৃত নয়। নাম ও রূপের আবরণ অপসারিত হলে এক ও অভিন্ন পরম সত্যই অবশিষ্ট থাকে। যেমন বিভিন্ন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ একই অগ্নিতত্ত্বের প্রকাশ, তেমনই অসংখ্য জীবাত্মাও একই পরমাত্মার প্রকাশ।[৮] ব্রহ্ম সমগ্র জগতের অধিষ্ঠান ও আধার। তাঁর উপরেই জগতের বহুত্ব কল্পিত হয়েছে। জীব ও জগত যে পরম সত্যের উপর নির্ভরশীল, সেই পরম ব্রহ্মকে জানা হলেই সমস্ত কার্যবস্তুর প্রকৃত কারণকে জানা হয়। স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের জ্যোতিতেই জগতের সমস্ত কিছু প্রকাশিত। তিনি নিজে অন্যকোনো প্রকাশের উপর নির্ভরশীল নন; বরং তাঁর চৈতন্যের কারণেই সমস্তকিছু জ্ঞাত ও প্রকাশিত হয়। মুণ্ডক উপনিষদে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্য ধ্যানের এক অসাধারণ উপমা দেওয়া হয়েছে— 'ওঁ' ধনু, জীবাত্মা শর এবং ব্রহ্ম সেই শর-এর লক্ষ্য। অর্থাৎ 'ওঁকার'-কে অবলম্বন করে জীবাত্মাকে পরম ব্রহ্মের দিকে একাগ্রচিত্তে পরিচালিত করতে হবে। লক্ষ্যভেদ করতে হলে যেমন শরকে প্রথমে সুনিপুণভাবে শাণিত করতে হয়, তেমনই ধ্যান ও সাধনার দ্বারা মনকে পরিশুদ্ধ ও একাগ্র করতে হয়। ধ্যানরত সাধকের মন যেন বিচলিত না হয় এবং ব্রহ্মচিন্তায় সম্পূর্ণভাবে তন্ময় হয়ে থাকে। একাগ্রতার সঙ্গে ওঁকারের ধ্যান করতে করতে জীবাত্মা নিজের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে।[৯] তখন জীব ও পরমাত্মার মধ্যে যে আপাত ভেদ রয়েছে, তা দূরীভূত হয়। সাধক উপলব্ধি করেন যে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ সেই পরম চৈতন্যসত্তা, যা সর্বত্র বিরাজমান। মুণ্ডক উপনিষদে আরও একটি সুন্দর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে হৃদয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন রথের চক্রের সমস্ত অর বা শলাকা চক্রের কেন্দ্রে এসে মিলিত হয়, তেমনই সমস্ত নাড়ী হৃদয়ে এসে মিলিত হয়।[১০] সেই হৃদয়েই পরমাত্মার অধিষ্ঠান বলে উপনিষদীয় সাধনায় অনুভূত হয়। তিনি এক হয়েও বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং সমস্ত জীবের অন্তরে বিরাজমান থাকেন। ব্রহ্ম নিরাকার, অরূপ ও ইন্দ্রিয়াতীত। তাই তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে কোনো রূপের মাধ্যমে ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। এই কারণে ওঁকারকে ব্রহ্মের প্রতীক বা ধ্যানের প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'ওঁ'-এর ধ্যানের মাধ্যমে সাধক ধীরে ধীরে বহির্জগতের নাম-রূপের আকর্ষণ অতিক্রম করে অন্তর্নিহিত চৈতন্যের দিকে অগ্রসর হন। এই ধ্যানের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল অজ্ঞানতা ও অন্ধকার অতিক্রম করে পরম জ্যোতির উপলব্ধি করা। যে পরম তত্ত্ব অন্ধকারের অতীত, সেই ব্রহ্মের উপলব্ধিই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। ওঁকারকে অবলম্বন করে একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মচিন্তার অভ্যাস করলে সাধক ধীরে ধীরে অবিদ্যার বন্ধন অতিক্রম করে আত্মস্বরূপ উপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে পারেন। অতএব, মুণ্ডক উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের মূল শিক্ষা হল— বহুর মধ্যে এককে উপলব্ধি করা, নাম-রূপের আড়ালে অবস্থিত পরম সত্যকে জানা এবং আত্মাকে সেই পরম চৈতন্যের সঙ্গে অভিন্নরূপে উপলব্ধি করা। ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ, ব্রহ্মই তার আধার এবং পরিণামে সমস্ত নাম-রূপের লয়ও সেই ব্রহ্মেই। আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান ও ধ্যানের মাধ্যমে মানুষ এই পরম সত্যকে উপলব্ধি করে অজ্ঞানতার অন্ধকার অতিক্রম করে অমৃতের পথে অগ্রসর হতে পারে। যিনি কারণব্রহ্ম ও কার্যব্রহ্ম— উভয়কেই নিজের আত্মারূপে উপলব্ধি করেন, তাঁর হৃদয় সমস্ত অবিদ্যা ও বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। তাঁর অন্তরের সমস্ত সংশয়ের অবসান ঘটে এবং কর্মবন্ধনেরও ক্ষয় সাধিত হয়। উপনিষদীয় জ্ঞান মানুষের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে তাকে আত্মস্বরূপের উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায়। যেমন আলোর উদয়ে অন্ধকার দূর হয়ে যায়, তেমনই আত্মজ্ঞানের উদয়ে অবিদ্যার বিনাশ ঘটে।

বেদান্ত দর্শনে কর্ম প্রধানত তিন প্রকার— প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ। পূর্বজন্মের অসংখ্য কর্মের যে ফল এখনও ভোগ করা হয়নি এবং সঞ্চিত অবস্থায় রয়েছে, তাকে সঞ্চিত কর্ম বলা হয়। এই সঞ্চিত কর্মের একটি অংশ যখন ফলপ্রদ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে বর্তমান জন্মের শরীর, পরিবেশ ও জীবন-অভিজ্ঞতার কারণ হয়ে ওঠে, তখন তাকে প্রারব্ধ কর্ম বলা হয়। অর্থাৎ যে কর্মের ফল ইতিমধ্যে কার্যকর হয়ে বর্তমান দেহ ধারণের কারণ হয়েছে, সেটিই প্রারব্ধ। প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগের জন্যই জীব দেহ ধারণ করে। বর্তমান দেহের জীবনযাত্রা ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা প্রারব্ধ কর্মের সঙ্গে যুক্ত। আত্মজ্ঞান লাভের পরও যতদিন প্রারব্ধ কর্মের ফল অবশিষ্ট থাকে, ততদিন জ্ঞানীর দেহের অবস্থান বজায় থাকে। তাই আত্মজ্ঞান লাভ করলেও জ্ঞানীর দেহ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় না।অন্যদিকে, বর্তমান জীবনে মানুষ যে সমস্ত

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 17 - 26
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নতুন কর্ম সম্পাদন করে এবং যার ফল এখনও পরিণত হয়নি, তাকে ক্রিয়মাণ বা আগামী কর্ম বলা হয়। আত্মজ্ঞান লাভের পর জ্ঞানী ব্যক্তি কর্তার অহংকার থেকে মুক্ত হওয়ায় তাঁর ক্রিয়মাণ কর্ম আর ভবিষ্যৎ কর্মবন্ধনের কারণ হয় না। একইভাবে সঞ্চিত কর্মও আত্মজ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ হয় বলে অদ্বৈত বেদান্তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের ফল ইতিমধ্যে কার্যকর হওয়ায় তা দেহের অবসান পর্যন্ত চলতে থাকে। এই কারণে আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি দেহধারণ করেও মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারেন। এই অবস্থাকেই জীবন্মুক্তি বলা হয়। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি বাহ্যত জগতে অবস্থান করলেও জগতের নাম-রূপের প্রতি তাঁর আসক্তি থাকে না। তিনি উপলব্ধি করেন যে জগতের পারমার্থিক স্বাধীন অস্তিত্ব নেই; ব্রহ্মই একমাত্র পরম সত্য। ফলে জাগতিক সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, মান-অপমান প্রভৃতি তাঁকে পূর্বের মতো আবদ্ধ করতে পারে না। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি দেহধারণ করে থাকলেও অন্তরে তিনি মুক্ত। তিনি নিজের প্রকৃত স্বরূপকে দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের অতীত শুদ্ধ চৈতন্যরূপে উপলব্ধি করেন। তাঁর কর্ম আর ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয় না। তিনি লোককল্যাণের জন্য নিষ্কামভাবে কর্ম সম্পাদন করতে পারেন। এর ফলে সাধারণ মানুষও আদর্শ জীবনযাপনের প্রেরণা লাভ করে এবং ধীরে ধীরে আত্মশুদ্ধির পথে অগ্রসর হয়। পূর্বসঞ্চিত কর্মের যে অংশ প্রারব্ধরূপে ফল দিতে শুরু করেছে, তার ফল ভোগ শেষ হলে জ্ঞানীর দেহেরও অবসান ঘটে। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে তাঁর আর কোনো বন্ধন থাকে না। তখন জীবন্মুক্তির পর বিদেহমুক্তির অবস্থা লাভ হয়। এই অবস্থায় ব্যক্তিসত্তার সমস্ত উপাধি বিলুপ্ত হয়ে পরম ব্রহ্মের অদ্বৈত স্বরূপই অবশিষ্ট থাকে। অতএব, বেদান্তের দৃষ্টিতে জ্ঞানই অবিদ্যা ও কর্মবন্ধনের চূড়ান্ত নাশের উপায়। যেমন সূর্যের আলো অন্ধকারকে দূর করে, তেমনই আত্মজ্ঞান অজ্ঞানের আবরণ দূর করে। অজ্ঞান থেকেই কর্তা-ভোক্তার ভাব এবং কর্মবন্ধনের উৎপত্তি; আর আত্মজ্ঞান সেই অজ্ঞানতার অবসান ঘটিয়ে মানুষকে তার প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করায়।[১১] এই আত্মস্বরূপের উপলব্ধিই মুক্তির পরম পথ। হৃদয়ের অন্তর্গভীরে জ্যোতির্ময়, নির্মল, নিষ্কলঙ্ক, নিরাকার ও নিরবয়ব ব্রহ্মের অধিষ্ঠান।[১২] তিনি পরম শুদ্ধ এবং সমস্ত জ্যোতির্ময় বস্তুর প্রকাশক। তিনি নিত্য, জ্ঞানস্বরূপ ও স্বপ্রকাশ। তাঁকে প্রকাশ করার জন্য অন্যকোনো জ্যোতির প্রয়োজন হয় না; বরং তাঁর জ্যোতিতেই জগতের সমস্ত কিছু প্রকাশিত ও জ্ঞাত হয়। মুণ্ডক উপনিষদে ব্রহ্মের এই স্বপ্রকাশ স্বরূপ অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। সূর্যের কিরণ যেমন জগতের বিভিন্ন বস্তুকে প্রকাশ করে, কিন্তু সূর্য নিজে অন্য কোনো আলোর দ্বারা প্রকাশিত হন না, তেমনই ব্রহ্মকে কোনো বাহ্যিক জ্যোতির সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না। চন্দ্র, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ বা অগ্নি— কোনোটিই পরম ব্রহ্মকে প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। কারণ ব্রহ্ম নিজেই জ্যোতিরূপ এবং স্বপ্রকাশ। যেমন প্রদীপের আলো নিজের উপস্থিতির দ্বারা নিজেকেও প্রকাশ করে এবং অন্য বস্তুকেও দৃশ্যমান করে তোলে, তেমনই ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশমান। তবে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশকে জড় আলোর মতো বোঝা উচিত নয়; তিনি চৈতন্যস্বরূপ। তাঁর চৈতন্যের কারণেই ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির মাধ্যমে সমস্ত জ্ঞান সম্ভব হয়। তিনি জ্ঞানের বিষয়মাত্র নন, তিনি সমস্ত জ্ঞানের মূল আধার। ব্রহ্ম সমস্ত কিছুর উৎস ও পরম আশ্রয়। জগতের প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্ব তাঁর উপর নির্ভরশীল। ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে কোনো কিছুর স্বতন্ত্র ও পরম অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। যেমন সমুদ্রের উপর নির্ভর করেই তরঙ্গের অস্তিত্ব, তেমনই ব্রহ্মের উপর নির্ভর করেই নাম-রূপময় জগতের অস্তিত্ব। এই পরম ব্রহ্ম কোনো দূরবর্তী সত্তা নন। উপনিষদীয় দর্শনের অন্যতম গভীর শিক্ষা হল— সেই পরম চৈতন্য আমাদের হৃদয়ের মধ্যেই বিরাজমান। আত্মজ্ঞানীরাই সাধনা ও জ্ঞানের মাধ্যমে এই অন্তর্নিহিত ব্রহ্মসত্তাকে উপলব্ধি করতে পারেন। বাহ্যিক জগতের অনুসন্ধানের পাশাপাশি অন্তরের দিকে প্রত্যাবর্তন করেই মানুষ তার প্রকৃত স্বরূপকে জানতে পারে। ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে পার্থক্য মূলত অবিদ্যা ও উপাধিজনিত। দেহ, মন, ইন্দ্রিয় ও অহংকারের সঙ্গে আত্মাকে অভিন্ন মনে করার কারণেই মানুষ নিজেকে সীমাবদ্ধ ব্যক্তি বলে মনে করে। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ হলে এই ভেদবুদ্ধির অবসান ঘটে। তখন উপলব্ধি হয়— জীবের অন্তর্নিহিত চৈতন্য এবং পরম ব্রহ্মের চৈতন্যস্বরূপ মূলত অভিন্ন। অতএব, ব্রহ্মই পরম জ্যোতি, ব্রহ্মই জ্ঞানের উৎস এবং ব্রহ্মই স্তসম অস্তিত্বের আধার। তিনি অন্যকোনো জ্যোতির দ্বারা প্রকাশিত নন; তাঁর স্বপ্রকাশ চৈতন্যের কারণেই সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, অগ্নি থেকে শুরু করে সমগ্র বিশ্বজগতের প্রকাশ সম্ভব হয়েছে।[১৩] মানুষের হৃদয়ের অন্তর্গভীরে সেই জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম বিরাজমান। আত্মজ্ঞান লাভের মাধ্যমে মানুষ যখন সেই অন্তর্নিহিত পরম সত্তাকে উপলব্ধি করে, তখনই তার জীবনের পরম সত্য ও প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। মুণ্ডক উপনিষদে তাঁদের সম্পর্ক বোঝাতে একই বৃক্ষে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 17 - 26
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অবস্থানরত দুটি পাখির অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। দুটি পাখি সর্বদা পরস্পরের সঙ্গী হয়ে একই বৃক্ষে অবস্থান করে। তাদের মধ্যে একটি পাখি সেই বৃক্ষের তিক্ত ও মধুর বিভিন্ন ফল ভোগ করে, আর অন্য পাখিটি কোনো ফল ভোগ না করে কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীরূপে অবস্থান করে। এই দৃষ্টান্তে বৃক্ষটি মানুষের দেহের প্রতীক এবং দুটি পাখির একটি জীবাত্মা ও অপরটি পরমাত্মার প্রতীক। জীবাত্মা দেহ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে এবং ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জগতের বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সুখ-দুঃখ অনুভব করে।[১৪] ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে যে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হয়, জীবাত্মা নিজেকে সেই অভিজ্ঞতার কর্তা ও ভোক্তা বলে মনে করে। মানুষ যখন নিজেকে দেহ ও মনের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করে, তখন জগতের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি তার আসক্তি জন্মায়। ইন্দ্রিয়সুখের মাধ্যমে সে সুখ অনুভব করে এবং প্রতিকূল বিষয়ের সংস্পর্শে দুঃখ অনুভব করে। এভাবেই কর্ম, কর্মফল এবং সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীব সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। ফলভোগকারী পাখিটি এই সংসারবদ্ধ জীবাত্মারই প্রতীক। কিন্তু এই জীবাত্মার অন্তরেই আর-একটি পরম সত্তা বিরাজমান, যিনি কোনো কর্মফল ভোগ করেন না। তিনি চিরসাক্ষী, নির্লিপ্ত, অপরিণামী ও স্বপ্রকাশ। তিনি নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থেকে জীবের সমস্ত কর্ম ও অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়ে থাকেন। তিনিই পরমাত্মা বা সাক্ষীচৈতন্য। পরমাত্মা নিজে কোনো কর্ম করেন না এবং কোনো কর্মফলও ভোগ করেন না। তিনি কেবলমাত্র সাক্ষীরূপে সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর উপস্থিতিতেই জীবাত্মার মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশ ঘটে এবং জীব বিভিন্ন কর্মে প্রবৃত্ত হয়। যেমন সূর্যের উপস্থিতিতে পৃথিবীর সমস্ত কার্যকলাপ সম্পন্ন হয় অথচ সূর্য নিজে সেই কার্যকলাপের কর্তা নন, তেমনই পরমাত্মার চৈতন্যসান্নিধ্যে জীবের মধ্যে কর্মপ্রবৃত্তি ও জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে এই আপাত পার্থক্যের মূল কারণ হল অবিদ্যা। জীব যখন দেহ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে, তখন সে নিজেকে কর্তা ও ভোক্তা বলে মনে করে। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ হলে তার এই ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটে। তখন সে উপলব্ধি করে যে তার প্রকৃত স্বরূপ দেহ বা মন নয়; সে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। মুণ্ডক উপনিষদের এই দুই পাখির দৃষ্টান্তের গভীর তাৎপর্য হল—একই দেহরূপ বৃক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অবস্থান করলেও তাদের ভূমিকা এক নয়। জীবাত্মা কর্মফল ভোগ করে এবং সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করে; পরমাত্মা সর্বদা নির্লিপ্ত সাক্ষীরূপে অবস্থান করেন। জীব যখন পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করে এবং নিজের প্রকৃত চৈতন্যসত্তাকে জানতে পারে, তখন তার শোক, মোহ ও বন্ধনের অবসান ঘটে। অতএব, দুটি পাখির এই উপমা জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ককে অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ করে। একদিকে আছে কর্মফলভোগী জীব, অন্যদিকে আছে সর্বদা নির্লিপ্ত ও অপরিণামী সাক্ষী পরমাত্মা। আত্মজ্ঞান লাভের মাধ্যমে জীব যখন নিজের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে, তখন সে বুঝতে পারে যে তার অন্তর্নিহিত চৈতন্যই পরম সত্যের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এই উপলব্ধিই তাকে সংসারের সুখ-দুঃখ ও বন্ধনের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই দেহে অবস্থান করলেও জীবাত্মা দীর্ঘকাল নিজের প্রকৃত আত্মস্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। অবিদ্যার প্রভাবে সে নিজেকে দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করে এবং সংসারের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। ফলে সে সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, আশা-নিরাশা প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শোক ও মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। কিন্তু যখন তার মধ্যে আত্মবোধ জাগ্রত হয়, তখন সে ধীরে ধীরে সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে নিজের প্রকৃত মহিমাকে উপলব্ধি করতে পারে। আত্মজ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে তার শোক ও মোহের অবসান ঘটে। যে ব্যক্তি দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের সঙ্গে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করে, সে প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রক না হয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের আকর্ষণ তাকে পরিচালিত করে এবং কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ রাখে। ফলে সে নিজের প্রকৃত স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। একসময় তার মধ্যে প্রশ্ন জাগে—কে সেই সত্তা, যিনি সুখ-দুঃখের দ্বারা অভিভূত হন না, কর্মফলের দ্বারা লিপ্ত হন না এবং সর্বদা নির্লিপ্ত সাক্ষীরূপে অবস্থান করেন? এই প্রশ্ন থেকেই শুরু হয় আত্মঅনুসন্ধান। নিরন্তর আত্মচিন্তা, ধ্যান, উপাসনা ও সাধনার ফলে তার চিত্ত ক্রমশ শুদ্ধ হয় এবং আত্মসংযমের শক্তি বৃদ্ধি পায়। তখন সে নিজের হৃদয়ের মধ্যেই পরমাত্মার উপস্থিতি অনুভব করতে সক্ষম হয়।আত্মজ্ঞান গভীরতর হলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে আপাত ভেদ রয়েছে, তা বিলুপ্ত হয়। সাধক উপলব্ধি করেন যে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ দেহ, মন বা ইন্দ্রিয় নয়; তিনি শুদ্ধ, অসংসারী, সর্বব্যাপী চৈতন্যসত্তা। তখন পৃথক ব্যক্তিসত্তার ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়ে যায় এবং পরম সত্যের সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি জাগে। যতক্ষণ মানুষ নিজেকে ঈশ্বর বা পরম সত্য থেকে পৃথক বলে মনে করে এবং নিজেকে সমস্ত কর্মের কর্তা ও সুখ-

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 17 - 26
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দুঃখের ভোক্তা বলে মনে করে, ততক্ষণ সে প্রকৃত অর্থে পরাধীন। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা যখন চিত্তশুদ্ধি ঘটে এবং মন পরমতত্ত্বে সমাহিত হয়, তখন মানুষের মধ্যে আত্মস্বরূপের উপলব্ধি জাগে। সে উপলব্ধি করে— তার প্রকৃত সত্তা অসংসারী, শুদ্ধ, চৈতন্যময় ও সর্বব্যাপী। কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারাই আত্মজীবনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। যে ব্যক্তি কেবল দুঃখকে জয় করতে চায় কিন্তু সুখের প্রতি আসক্ত থাকে, তার মুক্তি সম্পূর্ণ হয় না। সুখ ও দুঃখ—উভয় দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠতে পারলেই মানুষ প্রকৃত সমত্ব ও স্বাধীনতা লাভ করে। এইভাবেই আধ্যাত্মিক জীবনে সত্যিকারের বিজয় অর্জিত হয়। আধ্যাত্মিক জীবনের এই জয় মিথ্যার দ্বারা নয়, সত্যের দ্বারাই সম্ভব। সত্যই মানুষের দেবত্বের পথ উন্মুক্ত করে। ঋষিগণ সত্যকে অবলম্বন করেই পরম জ্ঞান ও পূর্ণতার সন্ধান করেছেন। সত্যের মাধ্যমেই মানবজীবনের পরম পুরুষার্থ অর্জন করা সম্ভব। তাই সত্য আধ্যাত্মিক জীবনের মূল সম্পদ। উপাসনামার্গের সাধকের ক্ষেত্রে দেবযানমার্গের ধারণা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উপাসক ধীরে ধীরে উচ্চতর আধ্যাত্মিক স্তরে অগ্রসর হয়ে ব্রহ্মলোক লাভ করেন এবং পরম সত্যের উপলব্ধির দিকে এগিয়ে যান। অপরদিকে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের মাধ্যমে সাধক সরাসরি মুক্তির পথে অগ্রসর হন। আত্মজ্ঞানের ফলে তিনি অনন্ত শান্তি, পরম আনন্দ ও অভয় লাভ করেন। তবে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য অন্তরের শক্তি ও দৃঢ়তা অপরিহার্য। দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি সহজে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। সংসারের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তিই মানুষের দুর্বলতার অন্যতম কারণ। জাগতিক বস্তু, ভোগ ও আসক্তির বন্ধন যতই দৃঢ় হয়, আত্মস্বরূপের প্রতি মনোযোগ ততই ক্ষীণ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি শারীরিক, মানসিক ও নৈতিকভাবে দৃঢ়, সংযমী এবং সত্যনিষ্ঠ, সে আত্মজ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়। জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হয়ে এবং সর্বদা আত্মতত্ত্বের চিন্তা ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকলে মানুষের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলি ক্রমশ দূর হয়। চিত্তশুদ্ধি, আত্মসংযম, সত্যনিষ্ঠা, বৈরাগ্য ও আত্মচিন্তার মাধ্যমে সাধক নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করেন। অবশেষে তিনি উপলব্ধি করেন যে যে পরম সত্যকে তিনি বাইরে অনুসন্ধান করছিলেন, সেই সত্য তাঁর নিজের হৃদয়ের মধ্যেই চৈতন্যস্বরূপে বিরাজমান। এই আত্মোপলব্ধিই আধ্যাত্মিক জীবনের চরম সার্থকতা। আত্মজ্ঞান মানুষকে শোক, মোহ, ভয় ও বন্ধনের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায় এবং তাকে অনন্ত শান্তি ও পরম আনন্দের অধিকারী করে তোলে। মুণ্ডকোপনিষদে সত্য, ধর্ম, তপস্যা, জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্যের ভিত্তির উপর সাধনার সৌধ নির্মাণের কথা বলা হয়েছে।[১৫] এই সাধনাপথে তপস্যাকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে নির্দেশ করা হয়েছে। উপনিষদে বলা হয়েছে— সত্য, তপস্যা, সম্যক্‌জ্ঞান এবং ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমে আত্মস্বরূপের উপলব্ধি সম্ভব। অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর জীবনে তপস্যা কেবল একটি বাহ্যিক সাধনপদ্ধতি নয়; এটি চিত্তশুদ্ধি, একাগ্রতা এবং আত্মসাক্ষাৎকারের অন্যতম প্রধান উপায়। ‘তপস্যা’ বলতে সাধারণভাবে কৃচ্ছ্রসাধন, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা কিংবা ইন্দ্রিয়সংযমকে বোঝানো হলেও এর গভীরতর অর্থ হল চিত্তের একাগ্রতা ও শক্তির কেন্দ্রীভবন। সমস্ত বিচ্ছিন্নতা ও বহির্মুখিতা থেকে মনকে প্রত্যাহার করে একটি উচ্চতর সত্যের প্রতি সম্পূর্ণভাবে নিবিষ্ট করাই তপস্যার প্রকৃত তাৎপর্য। যখন মানুষের মন বহু বিষয়ের প্রতি ছড়িয়ে না থেকে একটি মহান লক্ষ্যের দিকে সম্পূর্ণভাবে নিবদ্ধ হয়, তখন তার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ঘটে। এই একাগ্রতা থেকেই তন্ময়তা এবং তন্ময়তা থেকেই আত্মস্বরূপের উপলব্ধির পথ উন্মুক্ত হয়। সৃষ্টির সূচনাতেও তপস্যার একটি গভীর তাৎপর্য লক্ষ করা যায়। উপনিষদীয় ভাবনায় সৃষ্টির পূর্বে যে মহাচৈতন্যে সৃষ্টির সম্ভাবনা নিহিত ছিল, সৃষ্টির প্রকাশ যেন সেই চেতনার কেন্দ্রীভূত শক্তিরই বিকাশ। অর্থাৎ তপস্যার অন্তর্নিহিত শক্তি হল শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা এবং সেই শক্তিকে একটি নির্দিষ্ট মহৎ উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করা। তাই তপস্যা মানুষকে দুর্বল করে না; বরং তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত ও সুসংহত করে। তপস্যার মাধ্যমে চেতনার রূপান্তর ঘটে এবং মানুষ ধীরে ধীরে বহির্জগতের আসক্তি অতিক্রম করে অন্তর্জগতের সত্যের দিকে অগ্রসর হয়।

উপনিষদ আমাদের শিক্ষা দেয়— সত্য, তপস্যা, জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য পরস্পর-সম্পূরক সাধনপদ্ধতি। তপস্যা চিত্তকে একাগ্র করে, ব্রহ্মচর্য ইন্দ্রিয় ও জীবনশক্তিকে সংযত করে, জ্ঞান সত্যস্বরূপকে প্রকাশ করে এবং সত্য মানুষকে পরম বাস্তবতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করে। এই সাধনার সমন্বয়ের মাধ্যমেই পরম সত্যের উপলব্ধি সম্ভব। কেবল বাহ্যিক আচার বা আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে ব্রহ্মকে লাভ করা যায় না; অন্তরের শুদ্ধি, সংযম, একাগ্রতা ও জ্ঞানই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রকৃত প্রস্তুতি। উপনিষদীয় দর্শনে মুক্তি কোনো নতুন অবস্থায় গমন নয়; বরং নিজের স্বাভাবিক আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 17 - 26
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অবিদ্যার কারণে মানুষ নিজের প্রকৃত স্বরূপকে ভুলে গিয়ে দেহ, মন, ইন্দ্রিয় এবং সংসারকে নিজের চরম পরিচয় বলে মনে করে। তপস্যা ও আত্মজ্ঞান সেই অজ্ঞতার আবরণ দূর করে। তখন মানুষ উপলব্ধি করে যে তার প্রকৃত সত্তা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। নিজের স্বরূপকে জানতে পারাই প্রকৃত অর্থে জেগে ওঠা। এই আত্মোপলব্ধির অর্থ জগতের প্রতি বিরাগ বা জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া নয়। বরং আত্মস্বরূপের উপলব্ধির পর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটে। সে সমস্ত সত্তার মধ্যে একই চৈতন্যের প্রকাশ অনুভব করে। ফলে জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিচ্ছেদের নয়, বরং ঐক্য ও তন্ময়তার। ব্যক্তিসত্তার সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে সে পরম ব্যাপ্তির মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করে। এই অবস্থায় 'আমি' ও 'অন্য'—এই বিভেদের সংকীর্ণতা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে এবং সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে এক পরম ঐক্য অনুভূত হয়। সত্যই জয়লাভ করে, অসত্য কখনও নয়। এখানে 'সত্য' বলতে কেবল দৈনন্দিন জীবনের সত্য কথা বলা বোঝায় না; উপনিষদের গভীর দার্শনিক অর্থে সত্য হল চিরন্তন ও অবিনশ্বর ব্রহ্মতত্ত্ব। এই মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, সত্যের পথ অনুসরণ করেই মানুষ পরম সত্য বা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারে। অসত্য, অজ্ঞান ও মোহ মানুষকে পার্থিব বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ রাখে; কিন্তু সত্য, জ্ঞান ও আত্মসংযমের মাধ্যমে মানুষ পরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। তাই সত্যনিষ্ঠ জীবন কেবল নৈতিক আদর্শ নয়, আত্মজ্ঞান ও মোক্ষলাভের পথও বটে। সত্যের দ্বারাই দেবযান বা পরম সত্যের পথ প্রসারিত হয় এবং সেই পথ ধরে ঋষিগণ পরম সত্যের অধিষ্ঠানে পৌঁছেছেন।[১৬] আত্মজ্ঞান লাভের জন্য দৃঢ় মন, সংযম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং অন্তরের পবিত্রতা অপরিহার্য। আত্মসাক্ষাৎকার দুর্বলতা বা অলসতার বিষয় নয়; এটি গভীর সাধনা ও আত্মপ্রচেষ্টার ফল।[১৭]

মুণ্ডকোপনিষদে এই আত্মোপলব্ধির ফল অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। পরমাত্মাকে উপলব্ধি করে ঋষিগণ জ্ঞানের দ্বারা পরিতৃপ্ত হন; তাঁদের অন্তরের সমস্ত সংশয় দূর হয় এবং তাঁরা গভীর প্রশান্তি লাভ করেন। সত্যদ্রষ্টা ব্যক্তি বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি লাভ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে পরম ব্রহ্মই সমস্ত অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত সত্য। এই উপলব্ধির ফলে রাগ, আসক্তি, ভয় ও দ্বন্দ্ব ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যায় এবং ব্যক্তি শান্ত, সংযত ও সমাহিত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হন। অতএব, আত্মাকে লাভ করা মানে এক অবস্থা থেকে অন্যকোনো নতুন অবস্থায় গমন করা নয়। আত্মা কোনো নতুন করে অর্জনযোগ্য বস্তু নয়; আত্মা নিত্যসিদ্ধ। অবিদ্যার কারণে তার স্বরূপ আমাদের কাছে আবৃত থাকে। তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, সত্য ও জ্ঞানের সাধনার মাধ্যমে সেই অবিদ্যার আবরণ দূর হলে নিজের নিত্যপূর্ণ স্বরূপই প্রকাশিত হয়। তাই মুক্তি হল কোথাও চলে যাওয়া নয়, বরং নিজের চিরন্তন পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া। মুণ্ডকোপনিষদের সাধনাদর্শের চূড়ান্ত শিক্ষা এখানেই— তপস্যার দ্বারা চিত্ত একাগ্র হয়, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা সংযম প্রতিষ্ঠিত হয়, জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা দূর হয় এবং সত্যের উপলব্ধির মাধ্যমে মানুষ নিজের নিত্য মুক্ত আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

Reference:

১. "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যুর্মা অমৃতং গময়॥" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ১।৩।২৮)
২. "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।" (মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।১।৩)
৩. "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ... তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোऽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" (মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।১।৫)
৪. বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥ (ঈশোপনিষৎ, ১১)
৫. অধিকারী তু বিধিবদ্ অধীতবেদবেদাঙ্গত্বেন আপাততঃ অধিগতাখিলবেদার্থঃ অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জনপুরঃসরং নিত্য-নৈমিত্তিক-প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিতান্তনির্ম্মলস্বান্তঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা।। (বেদান্তসার, ৬)
৬. নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ, শমাদিষট্কসম্পত্তিঃ, মুমুক্ষুত্বং চেতি সাধনচতুষ্টয়ম্। (বেদান্তসার, ৭)
৭. "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি, যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাত্ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥" (মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।১।৭)

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 17 - 26
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৮. "তদেতৎ সত্যং—যথা সুদীপ্তাত্ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥" (মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।১।১)

৯. "প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেত্॥" (মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।২।৪)

১০. "অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ। ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাত্॥" (মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।২।৬)

১১. "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" (মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।২।৮)

১২. "হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥" (মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।২।৯)

১৩. "ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥" (মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।২।১০)

১৪. "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥" (মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।১।১)

১৫. "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্। অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥" (মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।১।৫)

১৬. "সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥" (মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।১।৬)

১৭. "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্ তপসো বাপ্যলিঙ্গাত্। এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥" (মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।২।৪)

Bibliography:

উপনিষদ — স্বামী লোকেশ্বরানন্দ; আনন্দ পাবলিশার্স; ২০২৩; একাদশ মুদ্রণ।
উপনিষদের সন্দেশ — স্বামী রঙ্গনাথানন্দ; উদ্বোধন কার্যালয়; ষোড়শ পুনর্মুদ্রণ; মাঘ, ১৪২৬।
উপনিষদের অমৃত — গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়; শ্রী সারদা মঠ; দ্বিতীয় মুদ্রণ; জানুয়ারি, ২০১৪।
উপনিষদ গ্রন্থাবলী, সম্পাদিত — স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯২, দ্বাদশ সংস্করণ।
বেদান্তসার, স্বামী নিখিলানন্দ সম্পাদিত, অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৩১, ১ম সংস্করণ।